# প্রথম অধ্যায়

## *ভারতের আদিবাসী : ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত*

ভারত সরকার দ্বারা প্রকাশিত ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের আদিবাসী জনসংখ্যা ১০.৪৩ কোটি, যা মূল জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০০১ সালের আদমশুমারিতে ভারতের আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল মূল জনসংখ্যার ৮.২ শতাংশ (মণিপুর রাজ্যের মাও-মারাম, পাওমাতা এবং পুরুল সাব-ডিভিশন ব্যতীত)। স্বাধীন ভারতের প্রথম জনগণনায় আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল ১,৯১,১৯,০৫৪ জন বা ১৯৫৬ সালে তপশিলি তালিকা পরিমার্জনের ফলে ৬.২৩ শতাংশ, ১৯৬১ সালের আদমসুমারিতে ৬.৯ শতাংশ। ভারতের আদিবাসীদের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। এদেশের আদিম অধিবাসীদের ''আদিবাসী'' নামে চিহ্নিতকরণ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন প্রবণতা। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই শব্দের ব্যবহার ব্যাপ্তি পেয়েছে। ভেলেন ভান সেন্দাল ও এলেন বল জানাচ্ছেন ''সংস্কৃত 'আদি' (অর্থাৎ 'শুরু' অথবা 'আদিকালের') এবং 'বাসী' (অর্থাৎ অঞ্চলে 'বাস' বা বসতি আছে যার), 'অ্যাবরিজিন্স'-এর নিকটবর্তী।''[১] ব্রিটিশ উপনিবেশকালে ভারতে ''অ্যাবরিজিন্স'' শব্দটি আদিবাসী ধারণার ক্ষেত্রে তুলনামূলক বেশি প্রচলিত ছিল। ভেলেন ভান সেন্দাল ও এলেন বল আরও জানাচ্ছেন ডেভিড হার্ডিম্যান ''ট্রাইব''-এর তুলনায় ''আদিবাসী'' শব্দটিকেই বেশি পছন্দ করেন - ''তিনি স্বীকার করেছেন যে, এলাকা থেকে বা এলাকায় আগত অসংখ্য অভিবাসনের ফলে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর পক্ষে এই ধরনের দাবির যথার্থ ভিত্তি নেই। তবুও আদিবাসী শব্দটি একটি বিশেষ ঐতিহাসিক উন্নতির সঙ্গে যুক্ত, যা প্রতিরোধের সমান ইচ্ছা জাগিয়ে তুলেছিল এবং বহিরাগতের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের চেতনাকে সজাগ করেছিল।''[২] ''হিল ট্রাইব'' বা ''পাহাড়ি'' নাম ছিল ব্রিটিশযুগে শ্রেণিবিন্যাস বা বিভাজনের ঔপনিবেশিক নকশা। ''পাহাড়ি'' শব্দটি জাতিগত বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয়বাহী হয়ে উঠলেও আদিবাসীদের ধারণায় ''উপজাতি'' বা ''উপজাতীয়'' অভিধার কোনও নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। প্রশান্ত ত্রিপুরা বলছেন ''প্রচলিত ব্যবহারে ইংরেজি 'tribe'

শব্দটির, বা এর বাংলা প্রতিশব্দ 'উপজাতি'র একাধিক অর্থ ও ব্যঞ্জনা রয়েছে। তবে একটি পারিভাষিক শব্দ হিসাবেও, যেমনটা নৃবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়, এটিকে কখনো সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়নি। কারণ, যেভাবেই শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, বাস্তব বিশ্বে কোথায় একটি উপজাতি শেষ হয়েছে, আর কোথায় অন্য একটি শুরু হয়েছে, তা নির্ণয় করার সমস্যা থেকেই যায়।"[৩] আদিবাসী সংজ্ঞা নির্ধারণের মতো ভারতের আদিবাসী চিহ্নিতকরণও নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। সমাজতাত্ত্বিকেরা ভারতের আদিবাসী অনুসন্ধান ও চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন বা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা নয়, আরও যে যে লক্ষণগুলো বিচার করেছেন, তা হল - একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বিশ্বাসী গোষ্ঠী, যাদের মধ্যে "common dialect" থাকবে, ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে যারা "সর্বপ্রাণবাদী" (animistic) এবং মানসিকভাবে যারা পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী নয় ও নিজস্ব প্রাচীন প্রথা (old custom)-র সঙ্গে জুড়ে থাকতে চায় এবং যাদের জীবন ও কৌম সমাজ পরিচালিত হয় নিজস্ব প্রথাগত আইন (customary law) দ্বারা। যদিও এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যও একটি আদিবাসী গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে একমাত্র বা সম্পূর্ণ নয়। অর্থনৈতিকভাবে আদিবাসী জনজাতি পশুপালন, শিকার বা সহজপদ্ধতিতে শস্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যদিও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে এরা বর্তমানে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত। চাষের কাজে বা কলকারখানায় মজুরে ও খনিতে কুলি-কামিনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া আদিবাসীদের সংখ্যাও প্রচুর। ডি. এন. মজুমদার লিখছেন- " The economic status of the tribes varies from region to region. There are few tribes which can be described as 'pure hunters', and there are many tribes who supplement their crude farming with hunting and fishing, and pastoral tribes are not necessarily low down in the scale of cultural

life. The Ahirs and Gujars are pastoral till today, but they are not tribal in the sense we have defined them. The Todas are pastoral, but they represent a unique social structure with polyandry and a buffalo creed, which shows their exotic character in the context of Indian tribal cultures. Rearing of sheep, bison, cattle, pig and poultry is more or less common among the tribes, though the dependence of the tribes on animal food is not absolute."[৪] T. S. Das আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রধানত চারটি অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা চিহ্নিত করেছেন- "(a) Food-gatherers (b) Pastorals (c) Shifting cultivators (d) Settled agriculturist."[৫]

আদিবাসীকেন্দ্রিক আলোচনায় "অনার্য" শব্দটি এসে পড়ে প্রসঙ্গক্রমে। "অনার্য" আসলে তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত শব্দ, অর্থাৎ যে "আর্য" নয়, আর্যের মহিমাময় গরিমা যার নেই, সেইই অনার্য; অথচ "আর্য" কোনও জাতিপরিচয়জ্ঞাপক শব্দ নয়, ভাষা পরিচয়বাহী। যে জাতি এই ভাষায় কথা বলত, তারাই "আর্য" বলে পরবর্তীকালে পরিচিতি লাভ করে। পণ্ডিতদের মতে, প্রাচীনকালে ককেশয়েড মহাজাতির নর্ডিক ও আলপীয় গোষ্ঠীরা এই ভাষায় কথা বলত। জানা যায়, নর্ডিকরা আলপীয়দের থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি বর্বর ছিল। আলপীয়রা পরবর্তীকালে কৃষিকাজ শিখে গেলেও নর্ডিকরা পশুপালন ও যাযাবরবৃত্তিই বজায় রেখেছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে নর্ডিকরা খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ২০০০ থেকে ১৫০০ নাগাদ ভারতের পঞ্চনদের তীরে এসে উপস্থিত হয় এবং "আর্য" নামে পরিচিত হয়। "আর্য" ব্যতিরেকে ভারতের অন্য গোষ্ঠীরাই ছিল অনার্য। এই দেশের অনার্য নরগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান প্রোটো-অস্ট্রালয়েড ও দ্রাবিড়। দ্রাবিড় মূলত ভাষাবংশ, কিন্তু দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠী "দ্রাবিড়" নামে পরিচিত হয়। অবশ্য ভারতের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

বিশ্লেষণে রামশরণ শর্মা ভারতীয় জনগণকে চারটি গোষ্ঠীতে ভাগ করেন- "এই চারটি গোষ্ঠী হল নিগ্রিটো, অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলয়েড এবং ককেশয়েড। এই জাতিগত বিভাগ করা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এটি করা হয়েছিল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসারে।"[৬] নৃতাত্ত্বিক অতুল সুর অবশ্য মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রঙ, গায়ের রঙ, চোখের রঙ ও বৈশিষ্ট্য, দেহের দীর্ঘতা, মাথার খুলির আকৃতি, মুখের ও নাকের গঠন প্রভৃতি আবয়বিক লক্ষণের ভিত্তিতে ভারতের জনগণকে পাঁচটি নরগোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন- ১। প্রোটো-অস্ট্রালয়েড বা আদি-অস্ট্রাল, ২। দ্রাবিড়, ৩। আলপীয় ৪। নর্ডিক ৫। প্রত্ন-মঙ্গোলয়েড।[৭] তিনি "নিগ্রিটো"(নেগ্রিটো)-র পৃথক শ্রেণিকরণ না করলেও পরবর্তীকালে নৃতাত্ত্বিকরা ভারতীয় কিছু জনগোষ্ঠীর মধ্যে "নিগ্রিটো" উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। নীহাররঞ্জন রায় যেমন জানাচ্ছেন কিছু নৃতাত্ত্বিক মনে করেন ভারতের জনসৌধের প্রথম স্তরই নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু- "আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এবং মালয় উপদ্বীপে যে নেগ্রিটো জনের বাস ছিল এ তথ্য বহু পুরাতন। কিছুদিন আগে হাটন, লাপিক ও বিরজাশংকর গুহ মহাশয় দেখাইয়াছিলেন যে, আসামের অঙ্গামি নাগাদের মধ্যে এবং দক্ষিণ ভারতের পেরাম্বকুলম এবং আন্নামালাই পাহাড়ের কাদার ও পুলায়ানদের ভিতরে নিগ্রোবটু রক্তপ্রবাহ স্পষ্ট।"[৮] ভারতের কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর পার্বত্য অঞ্চলে ও দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে এই কুঞ্চিত চুল, খর্বাকার, গাত্র বর্ণ কালো এই বংশের মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন প্রোটো–অস্ট্রালয়েড রক্তের মধ্যেও নেগ্রিটো সংমিশ্রণ ঘটেছে। ভারতের নরগোষ্ঠীর মধ্যে আলপীয় ও নর্ডিক ককেশয়েড মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত। ককেশয়েড ব্যতীত বাকিরা অনার্য। "দ্রাবিড়" গোষ্ঠী নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। নৃতাত্ত্বিক অতুল সুর মনে করেন- "এরাই ভারতের প্রথম আগন্তুক জাতি। এরা দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে বলেই এদের 'দ্রাবিড়' বলা হয়। এই দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের

জাতিসমূহের মিল আছে। সেজন্য নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের "ভূমধ্য" বা "মেডিটেরেনিয়ান" নরগোষ্ঠীর লোক বলা হয়।"[৯] নীহাররঞ্জন রায় "বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)"-এ স্বীকার করে নিয়েছেন "দ্রাবিড়" ভাষা, কোনও নরগোষ্ঠীর লোক নন, কিন্তু এই দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানুষরা প্রাক্-আর্য যুগে কারা ছিল, কোন্ নরগোষ্ঠীর মানুষ এরা – তা নিয়ে মতভেদ আছে। সেই সঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন, আদি–অস্ট্রালদের পরবর্তীকালে ভারতে তিনটি দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠী প্রবেশ করে, এরমধ্যে "তৃতীয় ধারাটির সঙ্গে সুমেরীয়-আসীরীয়-বাবলনীয় প্রভৃতি ভূমধ্যনরগোষ্ঠীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এবং এই ধারাটিই হরপ্পা, মহেন-জো-দড়োর প্রাগৈতিগাসিক সিন্ধু-সভ্যতার জননী। ইহারা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল উত্তর-ভারতের সর্বত্র; তবে উত্তর-পূর্ব ভারতে গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায় পূর্বতন আদি-অস্ট্রেলীয় কোল-মুণ্ডা-শবর-নিষাদ-অসুরদের বিস্তৃতি ও প্রতাপ প্রবলতর থাকায় ইহারা বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-ভারতে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়।"[১০] খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ বছরের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে আর্যভাষী জাতিরা ভারতে প্রবেশ করলে এদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে। মনে করা হয়, সেইসময় সিন্ধু উপত্যকাজুড়ে সিন্ধুসভ্যতা ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি। পণ্ডিতেরা স্বীকার করে নিয়েছেন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা, যা সিন্ধু সভ্যতা নামেও প্রচলিত, তা ছিল মূলত দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর সভ্যতা। অন্যদিকে, গঙ্গা-যমুনা মধ্যবর্তী অঞ্চল জুড়ে ছিল প্রোটো-অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর বাস ও সংস্কৃতি। হরপ্পা সভ্যতায় এই জাতির অবদান আছে কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও অতুল সুর জানিয়েছেন, "আদি-অস্ট্রাল জাতির লোকেরা খর্বাকার ও তাদের মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপটা, গায়ের রঙ কালো ও মাথার চুল ঢেউখেলানো। মহেঞ্জোদারোয় ও তিনেভেলি জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের যেসকল মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে এই শ্রেণীর খুলিও আছে।"[১১] প্রস্তর যুগের অন্তিম পর্ব বা নবপলীয় যুগে মানুষ শিকারের ওপর

সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা ছেড়ে কৃষিকাজ শুরু করে, পরিবার ও সমাজ গড়ে ওঠে। নবপলীয় যুগের নিদর্শন (আয়ুধ) পাওয়া গেছে কাশ্মীরের বুরঝহোমে, তামিলনাড়ুর তিরনেলভেলি জেলায়, গুজরাটের সবরমতী নদী উপত্যকায়, নর্মদা ও মাহী উপত্যকায়, বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে। নবপলীয় যুগের পরেই তামাশ্ম সভ্যতার আবির্ভাব। নবপলীয় যুগের গ্রামীণ সভ্যতার ওপরেই তামাশ্ম সভ্যতার বিকাশ। পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর ও তামাশ্ম সভ্যতার বেশ কিছু প্রাপ্ত নিদর্শন এই অঞ্চলে সভ্যতার ধারাবাহিকতাকে প্রমাণ করে। হরপ্পা সভ্যতা ছিল মূলত তামাশ্ম সভ্যতা, ভারতে নবপলীয় সভ্যতার বিবর্তনেই ফলেই এই তামাশ্ম সভ্যতার পরিণতি। অন্যদিকে, অতুল সুর মনে করেন ভারতে তামাশ্ম সভ্যতার জন্মভূমি ছিল বাংলা। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর মাইগ্রেশন হয়েছিল।[১২] যদিও রামশরণ শর্মা কালানুক্রমিক যে তথ্য দিয়েছেন তাতে তিনি দেখিয়েছেন ভারতে পশ্চিম থেকে দক্ষিণ ও পূর্বে নব্যপ্রস্তর সভ্যতার পরিযান ঘটে।[১৩] আর্য ভাষাবংশশাখার গোষ্ঠী যখন ভারতের পঞ্চনদের তীরে এসে উপস্থিত হয়, তখন এই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে অর্থাৎ হরপ্পা সংস্কৃতির ধারক নরগোষ্ঠীর সঙ্গে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বিজিত এদেশের অধিবাসীরা তাদের কাছে ‘‘অসুর’’, ‘‘দাস’’, ‘‘দস্যু’’, ‘‘পণি’’, ‘‘নিষাদ’’, ‘‘রাক্ষস’’ নামে চিহ্নিত হয়ে যায়। ঋক্‌বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ২০ সূক্তের ৬ ও ৭ নম্বর ঋকে ‘‘দাস’’ এবং ‘‘কৃষ্ণযোনি দাস’’ সেনার ইন্দ্র কর্তৃক ধ্বংসের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলের ১২ সূক্তের ৪ নম্বর ঋকে ‘‘দাস বর্ণ’’কে নিকৃষ্ট ও গূঢ় স্থানে অবস্থাপিতের কথা আছে। চতুর্থ মণ্ডলের ২৬ সূক্তের ৩য় ঋকে ‘‘দিবোদাস’’কে শততম পুরী বাসের জন্য দেওয়ার কথা ইন্দ্র বলছেন, অথচ ‘‘দস্যু’’ প্রসঙ্গে বারবার ইন্দ্র কর্তৃক হননের কথা এসেছে। ‘‘দাস’’ ও ‘‘দস্যু’’ উভয়েই অনার্য হলেও দু’টি পৃথক গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে। চতুর্থ মণ্ডলের ২৮ সূক্তের ৩য় ঋকে ‘‘দাস’’ এবং ‘‘দস্যু’’ উভয়ের একইসঙ্গে উল্লেখ আছে। দস্যুদের বধ করে ‘‘আর্যবর্ণ’’কে রক্ষা করার প্রসঙ্গ

আছে তৃতীয় মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের ৯ম ঋকে। সম্ভবত দাসদের সঙ্গে আর্যভাষীরা কোনো বোঝাপড়ায় যেতে পেরেছিল, তাদের পরাজিত করে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়েছিল, দস্যুদের বেলায় যা ঘটেনি। "The names of a number of Dasyu warriors and their Aryan opponents have been preserved in the Rig-Veda....The ancient Sanskrit works suggest that the Mundas and other cognate tribes occupied northern India before the forefather of Aryan Hindus entered the country."[১৪] "অসুর" শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ঋক্‌বেদে প্রযুক্ত। পঞ্চম মণ্ডলের ২৭ সূক্ত ও ১৫ সূক্তের ১ম ঋকে অগ্নি বা বৈশ্বানরকে "অসুর" বলা হচ্ছে। আবার প্রথম মণ্ডলের ৫৪ সূক্তের ৩য় ঋকে "অসুর"দের ও শত্রুদের ইন্দ্রকর্তৃক দূর করার কথা উল্লিখিত। আবার "আসুরি" ভাষা কোল বা মুণ্ডাভাষার একটা শাখা। নীহাররঞ্জন রায় *আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প* গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যপ্রমাণকে স্বীকার করে বলেছেন- "এই অসুর ভাষাভাষী লোকদেরই ঋক্বেদে 'অসুর' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হয় না। "আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প" গ্রন্থের আর একটি সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাকারের মতে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর বঙ্গের লোকেরা অসুর ভাষাভাষী: "অসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড়পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা"।[১৫] বর্তমানে, ভারতের সংবিধান "অসুর" নামক গোষ্ঠীকে "তপশিলি উপজাতি"ভুক্ত করেছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন "ঋক্‌বেদে" উল্লিখিত "নিষাদ"রা হল আদি-অস্ট্রাল গোষ্ঠী। "ঋক্‌বেদে"র একাধিক সূক্তে এই আগন্তুক শক্তি কর্তৃক ধ্বংসের বিবরণ দেওয়া আছে। "পুরন্দর" নামে যে চরিত্রটি কল্পিত, তিনি আসলে সিন্ধু নদের তীরে প্রাচীন সভ্যতার "পুর" অর্থাৎ নগর বা দুর্গ ধ্বংস করেন। ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভি. গর্ডন. চাইল্ড ছিলেন আর্যদের বর্বরতার প্রধান প্রবক্তা। তিনি জানিয়েছিলেন আর্যরা পৃথিবীর যেখানেই গেছে সেখানেই ধ্বংস চালিয়েছে-

"১৯২৬-২৭ সালে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর খোঁড়াখুঁড়ি তখনও চলছে, সে সময়েই ১৯২৬ সালেই তিনি প্রমাণ করেন যে, আর্যরা বর্বর এবং যাযাবর জাতি ছিল এবং পৃথিবীর যেখানেই তারা গেছে সেখানেই তারা উন্নত সভ্যতা ধ্বংস করেছে। তারপর গত ৭৫/৮০ বছর ধরে অধিকাংশ ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, নৃতাত্ত্বিকরা এই বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন।"[১৬] আর্যভাষী জাতির এদেশে আগমনের পরে প্রথমে যুদ্ধবিগ্রহ হলেও পরবর্তীসময়ে মধ্য ও পূর্বভাগে এসে অনার্যদের সঙ্গে নানাভাবে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। শুধু তাই নয়, এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও তারা গ্রহণ করে। বৈদিক পরবর্তী সাহিত্যে এই সংমিশ্রণটি স্পষ্ট, বিশেষত পুরাণে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সংমিশ্রণকে স্বীকার করে বলেছিলেন, "ক্রমে অনার্য[ভাষী] নরগোষ্ঠীর ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতাবাদে, পৌরাণিক পূজাদিতে, যোগচর্যায়, তান্ত্রিক মতবাদে ও অনুষ্ঠানে আর্য[ভাষী]দের বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য ও অনার্য [ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী] এই টানা ও পড়িয়ান মিলাইয়া হিন্দু-সভ্যতার বস্ত্রবয়ন করা হইল।"[১৭] যদিও নির্মিত এই হিন্দু সভ্যতায় অনার্য উপাদানই বেশি থাকল। ফরাসি ভাষাতত্ত্ববিদ্ পশিলুস্কি প্রমাণ করেছেন "লাঙ্গল" শব্দটি আদি–অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর ভাষা থেকে এসেছে। অস্ট্রিক ভাষা থেকে কৃষিকেন্দ্রিক বহু শব্দের আগমন এই গোষ্ঠীর দ্বারা গঙ্গা-যমুনা মধ্যবর্তী অঞ্চলে কৃষিকাজের প্রচলনকে প্রমাণ করে। "কর্পাস" শব্দটিও অস্ট্রিক, ফলে তুলার কাপড়ের ব্যবহারও আদি-অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন, যদিও আদি–অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর সকলেই কৃষিজীবী ছিল না; অরণ্যচারী শিকারজীবীও ছিল। বর্তমানেও আদিবাসী সম্প্রদায় বিশেষত আদি–অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীভুক্তেরা প্রকৃতি পূজা করে। বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পাহাড়, পশু–পাখির ওপর দেবত্ব আরোপ করা তাদের প্রাচীন রীতি। হিন্দু সভ্যতার নানা আচারে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ধান, দূর্বা, কলা, হলুদ, সুপারি, সিঁদুরের ব্যবহার

আসলে অনার্য আদিবাসী সংস্কৃতি গ্রহণ পরবর্তী বিবর্তনের ফলে এসেছে। নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন- "বৈদিক আর্যভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তই প্রাথমিক স্তরের। খড়, বাঁশ, লতাপাতার স্বল্পকালস্থায়ী কুঁড়েঘরে অথবা পশুচর্মনির্মিত তাঁবুতে ইহারা বাস করিত; গো-পালন জানিত, পশুমাংস পোড়াইয়া তাহাই আহার করিত এবং দলবদ্ধ হইয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত। যাযাবরত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশে আসিয়া যথাক্রমে কৃষি অর্থাৎ গ্রাম সভ্যতা এবং নগর সভ্যতার সঙ্গে ধীরে ধীরে তাহাদের পরিচয় ঘটিল এবং ক্রমে তাহারা দুই সভ্যতাকেই একান্তভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। এই সভ্যতার বাহন হইল আর্য ভাষা। এই দুই সভ্যতার সমন্বিত আর্যীকরণই হইল আর্যভাষীদের বিরাটকীর্তি; অথচ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের একান্ত নিজস্ব কিছু তাহাতে বিশেষ নাই।"[১৮] নগরসভ্যতা ছিল মূলত দ্রাবিড়ভাষীদের, স্মরণ করা যেতে পারে হরপ্পা–মহেঞ্জোদারো সভ্যতার এবং এখানে উক্ত কৃষিসভ্যতা মূলত অস্ট্রিকভাষী আদি–অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর। ভারতে অস্ট্রিক ভাষার মূলত দু'ভাগ - ১। কোল বা মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ। ২। মোনখ্‌মের। মোনখ্‌মের গোষ্ঠীর ভাষায় আসামের খাসিয়া আদিবাসীরা কথা বলেন। মুণ্ডা বা কোল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে- খারওয়ারি, কুরকু, খরিয়া, জুয়াঙ, শবর ও গডাবা। খারওয়ারির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে- সাঁওতালি, ভূমিজ, হো, আসুরি, আগারিয়া ও কোরওয়া। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন অস্ট্রিক গোষ্ঠীর এই শাখাকে "মুণ্ডা" নামে অভিহিত করলেও একে "কোল" শাখা বলাই বাঞ্ছনীয়। কারণ "Kol "কোল" এই নামটি ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। উড়িয়া, বাঙ্গালী ও বিহারিরা "কোল" বলিলে, দ্রাবিড়-ভাষী ওঁরাও, কন্ধ এবং মাল-পাহাড়িদের বাদ দিয়া, মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, তুরিম, মুনারি, ভূমিজ, খাড়িয়া, কোর্‌কু প্রভৃতিদেরই বুঝে; সুতরাং এই ব্যাপক সংজ্ঞা ব্যবহার করাই ভাল।"[১৯] দ্রাবিড়ভাষী আদিবাসীরা হল ওঁরাও, গোণ্ড, মাল-পাহাড়িয়া, খন্দ। আসামের

পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীরা, মূলত মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর জনজাতিদের মধ্যে খাসিয়া জনগোষ্ঠী বাদ দিয়ে সকলে ভোট-বর্মী ভাষায় কথা বলে।

ব্রিটিশ উপনিবেশকালেই ভারতে আদিবাসীগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিদেশি শাসকগোষ্ঠী প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য এই প্রক্রিয়া শুরু করেন। ভারতের মূলস্রোতের জনগণের থেকে, হিন্দু-মুসলমান থেকে স্বতন্ত্র আদিবাসীদের সম্পর্কে জানা, তাদের চিহ্নিতকরণ ছিল প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে ভারতীয় সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ জানার প্রয়াস। ব্রিটিশ প্রশাসক, নৃতাত্ত্বিক ছাড়াও পরবর্তীকালে মিশনারিরা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আদিবাসী এলাকায় কাজ করেছেন এবং আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক তাদের পর্যবেক্ষণকে লিপিবদ্ধ করেছেন। রিজলে, ডালটন এবং ও'ম্যালে পূর্ব ভারতের সমাজের ওপর করেছেন। রাসেলকে নিয়োগ করা হয়েছিল ভারতের মধ্যভাগের জন্য, দক্ষিণভারতের সমাজ নিয়ে থারস্টন এবং উত্তরভারতের সমাজ নিয়ে কাজ করেছেন ক্রুক। ভারতীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর বিস্তৃত কাজ করেছেন নৃতাত্ত্বিক রিভার্স। নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়কে বলা হয় "Father of Indian Ethnography"। ইনিই প্রথম ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক। ভারতীয় মুণ্ডা, ওঁরাও, বিরহড়, খেড়িয়া সম্প্রদায়ের ওপর গবেষণা চালিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র রায়। ভেরিয়ার এল্যুইন, নৃতাত্ত্বিক, যিনি ভারতে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন একজন খ্রিস্টান মিশনারি হিসেবে, ভারতের বৈগা, গোণ্ড প্রভৃতি একাধিক আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর দীর্ঘদিন গবেষণা করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক "tribe" চিহ্নিতকরণের এই প্রক্রিয়ার সমালোচনা করেছিলেন জগন্নাথ পথি ও দ্যভল-এর মতো গবেষকেরা। পথি মনে করেছিলেন প্রাচীন ভারতে উপজাতি বা tribe–এর ধারণা ছিল না। এই ধারণা বা "উপজাতি মিথ" নির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকারের অভিসন্ধি কাজ করেছিল বলেও পথি ও দ্যভল মনে করেন, যার মধ্যে আর্থিক স্বার্থসিদ্ধি অন্যতম। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে "tribe"দের

বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হলেও সবসময় তা বাস্তবসত্য ছিল না। ভারতীয় মূলস্রোতের সমাজের সঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহের নির্দিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক দূরত্ব থাকলেও একেবারে যোগাযোগরহিত সম্পর্ক ছিল, তা বলা যায় না, বিশেষত নির্মল কুমার বসু যখন আদিবাসী বা উপজাতিদের ওপর হিন্দুয়ানির প্রভাব স্বীকার করে নিচ্ছেন। রিজলেও আদিবাসীদের ওপর হিন্দুধর্মের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন- "The late census showed how rapidly the old aboriginals faiths are being effected, and what progress is being made in the absorption of the primitive races in the great system of Hinduism."[২০] এইধরনের প্রভাবের কথা কে. এস. সিং অস্বীকার করলেও সম্পূর্ণ "বিচ্ছিন্নতা"র ধারণাকে সরিয়ে রেখে বলা যায় ইংরেজ প্রশাসক বা নৃতাত্ত্বিকরা যাদের "আদিবাসী" বা "উপজাতি" বলে চিহ্নিত করেছিল, তাদের সঙ্গে যে হিন্দুসমাজের আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক ছিল, তা অনেকেই স্বীকার করে নেন। রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে ব্রিটিশ প্রশাসকের "উপজাতি" নির্মাণের দ্যভলের মতকে "উপজাতি-নির্মিতির বিষয়ে সবচেয়ে বিস্তৃত ও যুক্তিসঙ্গত আলোচনা" বলে স্বীকার করেও সমালোচক বিনয়ভূষণ চৌধুরী মনে করেছেন এই তত্ত্বে দ্যভলের ওপর "ওরিয়েন্টালিস্ট ডিসকোর্সে"র ছায়া পড়েছে। বিনয়ভূষণ চৌধুরী মনে করেন দ্যভল যে অর্থে "উপজাতি" শব্দকে ব্যবহার করেছেন, ব্রিটিশ প্রশাসকেরা সবসময় সেই অর্থে তা ব্যবহার করেননি; বরং ব্রিটিশ আমলাদের ওপরেও হিন্দুসমাজের প্রভাব পড়েছিল। হিন্দুসমাজ যেভাবে আদিবাসীগোষ্ঠীকে দেখত, আমলারাও প্রাথমিকভাবে সেভাবেই দেখেন। পরবর্তীকালে উপজাতিদের কারণে রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে তারা শাসকের কাছে আইনমান্যকারী সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত হয়। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের এই মতেরও পরিবর্তন ঘটে বলে বিনয়ভূষণ চৌধুরী মনে করেন। এমনকি উপজাতি বিদ্রোহও ছিল তাদের ওপর

নিপীড়নকারী বহিরাগত শত্রুর বিরোধিতা। এই বহিরাগতদের আদিবাসী জীবন থেকে একেবারে উৎপাটন করা সম্ভব নয় বলে সরকার ‘‘উপজাতি-সংরক্ষণ নীতি’’ অবলম্বন করেছিলেন।[২১] স্পষ্টতই বিনয়ভূষণ চৌধুরী এই ‘‘বহিরাগত’’ বলতে তাদের বুঝিয়েছেন, যাদের আদিবাসীরা ‘‘দিকু’’ বলে। তবে ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক নীতির ফলে আদিবাসী সমাজ ও অর্থনীতিতে যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। ঔপনিবেশিক শাসকের জমি, খাজনা ও জঙ্গলনীতি আদিবাসীদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপরতা সত্ত্বেও এতদিন ধরে চলে আসা জীবনের সমীকরণ ভেঙে দিয়েছিল। ব্যবসায়িক স্বার্থে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বহিরাগতদের আগমন শুধু নয়, বসবাস স্থায়ী হল। এই বসবাস তাদের পক্ষে শুধুমাত্র সুখকর হয়নি, তা নয়- শিকড় থেকে, জমি থেকে উৎখাত হতে হয়েছিল বহু আদিবাসীকে। W. W. Hunter *The Annals of Rural Bengal* গ্রন্থে বীরভূমের সাঁওতালদের জীবনের নানাদিক তুলে ধরতে গিয়ে হিন্দু মহাজনদের আগ্রাসনের ছবি তুলে ধরেছিলেন- “Hindu merchants flocked thither every winter after harvest to buy the crop, and by degrees each market-town throughout the settlement had its resident Hindu grain dealer. The Santal was ignorant and honest; the trading Hindu is keen and unscrupulous.... The Santal country came to be regarded by the less honourable orders of Hindus as a country where a fortune was to be made, no matter by what means, so that it was made rapidly. That the Hindus appear throughout their whole connection with the Santals as cheats, extortionist, and oppressors, tells neither more nor less disgracefully against the Hindu population in general, than the unscrupulous conduct of a few

English adventurers would tell against the honour of the English nation."[২২] বাটখারার কারচুপিতে কৃষিজীবী সৎ সাঁওতালরা আর্থিকভাবে শোষিত হত। হিন্দু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অসম বিনিময়ের ফলে তাদের জীবনের দৈনন্দিন চাহিদা মেটে না, নিদারুণ পরিশ্রম সত্ত্বেও বহিরাগত এই দিকুদের আর্থিক শোষণে শুরু হয় তীব্র অভাব। সেই অভাবের তাড়নায় ক্রমেই তারা মহাজনদের থেকে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়। একবার ঋণের জালে জড়িয়ে পড়লে সেই পরিবার সারাজীবনেও সেই ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারে না শতচেষ্টা করেও। কখনও কখনও ঋণগ্রস্ত পরিবার বাধ্য হয় পুরুষানুক্রমে সেই ঋণ শোধ করতে, অন্যথায় বেগার দিতে। আসলে, ঋণ ও সুদের হিসেব মহাজনদের হাতেই থাকত। ক্রমে ঋণগ্রস্ত পরিবারের জমি গ্রাস করত মহাজন এবং স্বাধীন আদিবাসী কৃষিজীবী মানুষজন মহাজনদের বেঠবেগারে পরিণত হত। ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সময়ে যে অরণ্য আইন প্রণয়ন করে, তাও অরণ্যনির্ভর আদিবাসী সম্প্রদায় ও জঙ্গল কেটে কৃষিজমি তৈরি করা আধা-কৃষিজীবী আদিবাসীদের বিপক্ষে গেছিল। ১৭৯৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা টিপু সুলতানের পরাস্ত হওয়ার পর দক্ষিণ ভারতের প্রভূত অরণ্যসম্পদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নজরে আসে। কোম্পানি এই অরণ্যসম্পদের মধ্যে সম্ভাবনা লক্ষ করে কিছু বিশেষজ্ঞ দ্বারা ভারতের বনভূমির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৮৬৪ সালে উদ্ভিদবিদ্ ড. ব্রাণ্ডিস সারা ভারতের বন সংরক্ষণের কাজে নিযুক্ত হন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় সংরক্ষিত বনভূমি গঠনের কাজ শুরু হয় ১৮৬৫ সাল নাগাদ। ১৮৬৫ সালের এই উদ্যোগ ব্রিটিশ সরকারের বন আইন তৈরির প্রথম প্রচেষ্টা বলে মনে করা হয়, যার দ্বারা ভারতের অরণ্যসম্পদের ওপর ভারতীয়দের এতদিনের অধিকারকে খর্ব করা হল। পরবর্তীকালে ১৮৭৮ সালে "অরণ্য আইন" এনে অরণ্যের ওপর নিজেদের প্রভাবকে ব্রিটিশ সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে। "বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর

১৮৭৮ সালের বন আইনের ২৯ নম্বর ধারার সুবাদে বিজ্ঞপ্তি ৪৮৪৫ (২ নভেম্বর ১৮৯৪) দ্বারা ঘোষণা করেছিলেন যে, ভাগলপুর বিভাগের সাঁওতাল পরগণা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নিম্নলিখিত প্রজাতির গাছ কাটা নিষিদ্ধ : যেমন (১) শাল, (২) সৎশাল, (৩) কুসুম, (৪) খেওয়া, (৫) গামহারকাশমার, (৬) মুর্গা, (৭) নিম, (৮) আম, (৯) তেঁতুল, (১০) জাম (১১) কেঁন্দ, (১২) মহুয়া, (১৩) কাঁঠাল, (১৬) আসন, (১৭) হেসেল, (১৮) টিলাই, (১৯) হোরো, (২০) মুরূপ, (২১) সেগুন, (২২) শিশু, (২৩) তাল।"[২৩] জ্বালানির জন্য শুকনো কাঠ সংগ্রহ করা ছাড়াও বিশেষ কিছু আদিবাসীদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে শাল গাছ। কিন্তু ব্রিটিশ শাসক প্রণীত এই অরণ্য আইনের ফলে আদিবাসীরা অরণ্যের ওপর নিজেদের এতদিনের অধিকার হারায় এবং অরণ্যকেন্দ্রিক তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন ভেঙে পড়ে ও সংস্কৃতি বিপন্ন হয়। জমি ও জঙ্গলের অধিকার হারানো আদিবাসীরাই বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ শাসক ও বহিরাগত হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। পরবর্তীকালে ১৯২৭-এ এই আইন সংশোধিত হয়। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত আইন অনুযায়ী অরণ্যকে ১। সংরক্ষিত অরণ্য ও ২। সুরক্ষিত অরণ্যে ভাগ করা হয়। স্বাধীনভারতে অবশ্য ১৯৮৮ সালের অরণ্য আইন সংশোধনের মধ্যে দিয়ে বনভূমিতে আদিবাসীদের বসবাসের মোটামুটি একটা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই আইনে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথ বন পরিচালনা পদ্ধতি স্থান পায়। অবশেষে, আদিবাসীদের অধিকারের পক্ষে ভারত সরকার কর্তৃক "The Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006 পাশ হয়।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক সরকার বেশ কিছু গোষ্ঠীকে "অপরাধপ্রবণ জাতি" হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। বংশগত অপরাধপ্রবণ তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ সরকার ১৮৭১ সালে "Criminal Tribes Act" আইনটি প্রণয়ন করেন। প্রথমে উত্তর ভারতের কিছু অংশে, ১৮৭৬ সালে

বাংলা প্রেসিডেন্সি ও পরবর্তীকালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বলবৎ করা হয়। পরবর্তীকালে ১৮৯৭ ও ১৯১১ সালে আইনটি সংশোধিত হয়। মীনা রাধাকৃষ্ণ জানাচ্ছেন- "In 1876 the Act was extended to certain parts of Bengal and in 1897 it was amended to enlarge the powers of the local government to notify communities and take action against a part of the 'gang' or community."[২৪] ১৯২৪ সালে আইনটি পুনরায় সংশোধিত হয়ে সারা ভারতে কার্যকর হয়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ১৯৪৯ সালে এই আইনটি বাতিল করা হয় এবং ১৯৫২ সালে অপরাধপ্রবণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত সম্প্রদায়কে "বিমুক্ত জাতি" ঘোষণা করা হয় ও ১৯৮টি গোষ্ঠী "বিমুক্ত জাতি" ঘোষিত হয়, যাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের লোধা শবররা অন্যতম।

ব্রিটিশ আমলে ভারতের ১৯৩১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে প্রথম "Primitive Tribes" শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয় এবং ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠী ও জনসংখ্যা লিপিবদ্ধ হয়। ১৯৪১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে শুধুমাত্র "Tribe" শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং অঞ্চলভেদে কোন্ আদিবাসী সম্প্রদায়ের কতজন রয়েছে - সেই তালিকাও প্রস্তুত হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ১৯৫০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর গেজেট নোটিফিকেশন করে রাষ্ট্রপতি "THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER, 1950" প্রকাশ করেন এবং "তপশিলি উপজাতি"র তালিকা প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সময় এই তালিকার পুনর্বিন্যাস ও সংশোধিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের সংবিধানের ৩৪২(১) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কোনো উপজাতি বা উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায় কিংবা তাদের কোনো অংশ বা গোষ্ঠীকে ঐ রাজ্যের বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের "তপশিলি উপজাতি" হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন। ৩৬৬(২৫) অনুচ্ছেদে "তপশিলি উপজাতি" কারা, সে সম্পর্কে স্পষ্ট করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৪০ নং ধারা অনুসারে কাকাসাহেব কালেকারের

সভাপতিত্বে দেশের প্রথম অনগ্রসরশ্রেণি কমিশন গঠন করেন ১৯৫৩ সালের ২৯শে জানুয়ারি। ১৯৫৫ সালের ৩০শে মার্চ কমিটি রিপোর্ট দেয়। এই কমিটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকার নিরিখে ২৩৯৯টি জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুত করে, যার মধ্যে ৮৩৭টি জনগোষ্ঠীকে চূড়ান্ত অনগ্রসর বলে জানায়। এই কমিশনের রিপোর্ট ও প্রস্তাবের ফলেই পরবর্তীকালে "The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act 1956" পাশ হয় এবং তপশিলভুক্ত আদিবাসীদের তালিকা সংশোধিত হয় The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Modification) Act 1956 দ্বারা। স্বাধীন ভারতের প্রথম তপশিলি উপজাতি তালিকা গঠন প্রসঙ্গে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত লোকুর (Lokur) কমিটির রিপোর্টে (The Advisory Committee on the Revision of the list of The Scheduled Castes and Scheduled Tribes) ছিল– "The specification of tribes and tribal communities as Scheduled Tribes present some problems. Even the social scientists have found it difficult to evolve a universally acceptable defination for a tribe. The difficulty in setting out formal criteria for defining a tribe arises from the fact that the tribes in India are, and have been for some decades, tribes in transition. The first serious attempt to list "primitive tribes" was, as in the case of depressed caste, made at the census of 1931. Subsequenty, under the Government of India Act, 1935, a list of "backward tribes" was specified for the Provinces of India. The list of Scheduled Tribes was prepared in 1950 by making additions to the list of backward tribes under the Government of India Act, 1935;"[২৫] সংবিধানের

৩৩৯নং অনুচ্ছেদ মেনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৬০ সালের ২৮শে এপ্রিল "Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission" গঠিত হয়, যার চেয়ারম্যান ছিলেন ইউ. এন. ধেবর এবং সদস্য ছিলেন ভেরিয়ার এল্যুইনের মতো ব্যক্তিত্ব। এই কমিশন ১৯৬১ সালে তার রিপোর্ট জমা দেয়। ধেবর-এর নামানুসারে এই কমিশন "ধেবর কমিশন" নামেও পরিচিত। কমিশনের রিপোর্টে আদিবাসীদের অবস্থা ও তাদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব ছাড়াও বিভিন্ন "তপশিলি আদিবাসী"দের মধ্যে উন্নতির পার্থক্যের কথাও উল্লিখিত হয়েছিল। কমিশনের এই রিপোর্ট ও পরবর্তীকালের আরও পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতিতে এই প্রায় অনুন্নত বা শ্লথ উন্নতিকারী আদিবাসী সম্প্রদায়কে "Primitive Tribal Group" নামে পৃথক করা হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫২টি সম্প্রদায়কে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাক্রমে আরও ২০টি, ২টি ও ১টি সম্প্রদায় এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ২০০৬ সালে এই উপবিভাগটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "Particularly vulnerable tribal group" এবং ২০১১ সালের সেন্সাসেও ভারতের তপশিলভুক্ত মোট ৭০৫টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ৭৫টি গোষ্ঠীকেই "Particularly vulnerable tribal group"-এর মধ্যে রাখা হয়েছে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিরহড়, লোধা ও টোটোরা রয়েছে। ভারতীয় সংবিধান ভারতের আদিবাসীদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা রেখেছে। তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের জন্য প্রথম কমিশন গঠিত হয় ১৯৭৮ সালের আগস্টে, ভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রির সভাপতিত্বে। পরবর্তীকালে সংবিধানের "The Constitution (Sixty fifth) Amendment Act, 1990" অনুসারে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের জন্য "National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes" গঠিত হয় ১৯৯২-তে। এই কমিশন

পরবর্তীকালে সংবিধানের ৮৯তম সংশোধন অনুযায়ী [The Constitution(89th Amendment)act, 2003] দু'টি স্বতন্ত্র কমিশনে ভাগ হয়ে যায় ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ সালে- ১। National Commission for Scheduled Castes ২। National Commission for Scheduled Tribes। "National Commission for Scheduled Tribes" গঠিত হয় ২০০৪ সালে, কুনওয়ার সিং-এর সভাপতিত্বে। এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কমিশনের chairperson ছিলেন যথাক্রমে উর্মিলা সিং, রামেশ্বর ওঁরাও। রামেশ্বর ওঁরাও দুইপর্বে দায়িত্ব সামলেছেন। নন্দ কুমার সাঁই ছিলেন রামেশ্বর ওঁরাও পরবর্তী চেয়ারপার্সন। বর্তমানে এই দায়িত্ব নিয়েছেন হর্ষ চৌহান। ভারতীয় সংবিধান তপশিলি উপজাতিদের জন্য শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বলয় প্রদান করেছে। সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২৩, ২৫, ২৯ ও ৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদ বা ধারাতে তপশিলি জাতির মতো তপশিলি উপজাতিদেরও তাদের প্রতি হওয়া বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ও সমানাধিকার দিয়েছে। সংবিধানের চতুর্থ অংশের ৪৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."[২৬] ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদে যথাক্রমে লোকসভা, বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভাতে আসন সংরক্ষণ ও ৩৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদে সরকারি চাকরির বিভিন্ন পদে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। ১৯৪৯ সালে পাশ হওয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপশিলে আদিবাসী এলাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। তপশিলভুক্ত এলাকা চিহ্নিতকরণ, স্বশাসন, আদিবাসী জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত বিশেষ ব্যবস্থা বা

নিষেধাজ্ঞা, "Tribal Advisory Council" (পঞ্চম তপশিল), "Autonomous District Council", "Autonomous Region Council", (ষষ্ঠ তপশিল) গড়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। পঞ্চম তপশিলে যে দশটি রাজ্যের তপশিল এলাকা অন্তর্ভুক্ত, তা হল- অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান। ষষ্ঠ তপশিলে যে যে রাজ্যে আদিবাসী এলাকা অন্তর্ভুক্ত, তা হল- আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম। পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপশিল অতিরিক্ত আদিবাসী এলাকায় আদিবাসীদের স্বশাসনের অধিকারকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে "The Provisions of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996" বা PESA। আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করতে ও কল্যাণের জন্য বিভিন্ন সময়ে সংবিধান সংশোধনের মধ্যে দিয়ে নানা আইন নিয়ে আসা হচ্ছে। তপশিলভুক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের তালিকা পরিমার্জিত হচ্ছে। ২০১১ আদমশুমারি পর্যন্ত যে ৭০৫টি আদিবাসী সম্প্রদায় "তপশিলি উপজাতি" হিসেবে রাষ্ট্রের দ্বারা চিহ্নিত, তাদেরকে ধরেই গবেষণায় মূলপর্বে প্রবেশ করেছি অর্থাৎ বাংলা উপন্যাসে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধান করেছি। ভারতের আদিবাসীদের ঘিরে নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা, পরাধীন ভারতে আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক ইতিহাস ও স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র কর্তৃক আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ তাদের সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে নানা পরতে জড়িয়ে আছে, ফলে বাংলা উপন্যাসে সেই গোষ্ঠীজীবনের প্রতিফলনের আলোচনায় এই ইতিহাসকে অস্বীকার করার কোনও অবকাশ ছিল না।

**তথ্যসূত্র :**

১। ভেলাম ভান সেন্দেল, এলেন বল, "ভূমিকা: নামে কি এসে যায়?" *বাংলার বহুজাতি : বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ,* ভেলাম ভান সেন্দেল, এলেন বল সম্পাদিত, আই সি বি এস, দিল্লি, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১৬

২। ভেলাম ভান সেন্দেল, এলেন বল, "ভূমিকা: নামে কি এসে যায়?" *বাংলার বহুজাতি : বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ,* ভেলাম ভান সেন্দেল, এলেন বল সম্পাদিত আই সি বি এস, দিল্লি, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১৫

৩। প্রশান্ত ত্রিপুরা, "পাহাড়ি গোষ্ঠীপরিচয়ের ঔপনিবেশিক ভিত্তি", *বাংলার বহুজাতি : বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ,* ভেলাম ভান সেন্দেল, এলেন বল সম্পাদিত, আই সি বি এস, দিল্লি, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৮৯

৪। D. N. Majumdar, "Approch to Tribal Problems", *Applied Anthropology in India,* Edited by L. P. Vidyarthi, Kitab Mahal, 2012, p- 131

৫। T. C. Das, "A Scheme for Tribal Welfare", *Applied Anthropology in India,* Edited by L. P. Vidyarthi, Kitab Mahal, 2012, p- 179

৬। রামশরণ শর্মা, *ভারতের প্রাচীন অতীত,* ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা- ৫৩

৭। ড. অতুল সুর, *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৫৪-৫৬

৮। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০, পৃষ্ঠা- ৩১

৯। ড. অতুল সুর, *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৫৫

১০। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০, পৃষ্ঠা- ৪৬

১১। ড. অতুল সুর, *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৫৪-৫৫

১২। ড. অতুল সুর, *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৪০-৪১

১৩। রামশরণ শর্মা, *ভারতের প্রাচীন অতীত,* ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা- ৬৭-৬৮

১৪। L. P. Vidyapati, Binay Kumar Rai, *The Tribal Culture of India*, Concept Publishing Company, New Delhi, Reprint 1985, p- 27

১৫। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০, পৃষ্ঠা- ৪৪-৪৫

১৬। প্রশান্ত প্রামাণিক, *হরপ্পার অনার্য গরিমা,* জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ২১০-২১১

১৭। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০, পৃষ্ঠা- ৪৮

১৮। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০, পৃষ্ঠা- ৫৩

১৯। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, "কোল-জাতির সংস্কৃতি", *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা,* দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত ও সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১২০

২০। H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal, Vol-1*, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1892, p- iii

২১। বিনয়ভূষণ চৌধুরী, "উপজাতি 'মিথ': ধারণার পুনর্বিবেচনা", *বাংলার বহুজাতি : বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ,* ভেলাম ভান সেন্দেল, এলেন বল সম্পাদিত, আই সি বি এস, দিল্লি, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৬৪-৬৫

২২। W. W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, West Bengal District Gazetteers, Government of West Bengal, Calcutta, 1996, p-158

২৩। পশুপতি প্রসাদ মাহাতো, ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ, পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, পূর্বালোক সংস্করণ, জুলাই ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩৮

২৪। Meena Radhakrishna, *Dishonoured by History 'Criminal Tribes' and British Colonial Policy,* Orient Longman, New Delhi, First Publication 2001, p- 30-31

২৫। Government of India, Department of Social Security, *The Report of Advisory Committee of The Revision of The Lists of The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Lokur Committee)*, 1965, p- 6, https://www.tribal.nic.in, Acccessed on 12/1/2020

২৬। Government of India, Ministry of Law and Justice Legislative Department, *The Constitution of India (as on 1st April, 2019),* 2019, p- 35, https://legislative.gov.in, Accessed on 12/1/2020